ভারতকে যে সব চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করতে হবে

রাজ্যসভার বিরোধী নেতা শ্রী অরুন জেটলির দেওয়া মুম্বই বিশ্ববিদ্যালয়ের কে সি কলেজে কে এম কুন্দনানি স্মারক ভাষণের নির্বাচিত অংশ

আমরা একইসঙ্গে হতাশা ও আশার যুগে বাস করছি। যখন আমরা চারিদিকের হতাশ পরিমণ্ডলকে দেখি, তখন জনমত হতাশ হতে বাধ্য। কিন্তু যখন আমরা ভারতের ঘুরে দাঁড়ানোর, এগিয়ে যাওয়ার শক্তিকে দেখি, তখন সেই হতাশাকে ছাপিয়ে আমরা আশাবাদী হই।
আমাদের দেশের ৬০ ভাগ লোকের জীবীকা হল কৃষি, কিন্তু আমাদের গড় জাতীয় উৎপাদনের মাত্র ১৬ শতাংশ আসে কৃষি থেকে। জি ডি পির ৬০ শতাংশ আসে পরিষেবা ক্ষেত্র থেকে। ভারতে পরিষেবা ক্ষেত্র বেড়েছে কারণ তাঁরা সরকার বা পরিকাঠামোর ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল নয়। কৃষি ক্ষেত্র থেকে লোকেদের পরিষেবা বা উৎপাদন শিল্পে নিয়ে যাওয়াটা আমাদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ।

রাজনীতির মান

সংসদীয় গণতন্ত্রে রাজনীতি দেশের জীবনকে প্রভাবিত করে। রাজনীতি দেশের নীতি তৈরী করে। আর সেই নীতি ঠিক করে দেশ কোন দিকে যাবে। তাই যে সব মানুষেরা দেশ শাসন করছেন, তাঁদের উচ্চতা যেন এমন হয়, যে তাঁরা দেশের লোকের প্রত্যাশা ও সুশাসনের শর্ত পূরণ করতে পারেন। যদি খারাপ শাসন সত্তেও ভারতের জি ডি পি ৯ শতাংশ হারে বাড়তে পারে, তা হলে সুশাসন হলে সেই বৃদ্ধির হার কতটা হতে পারে!
গত কয়েক দশক ধরে ভারতে সংগঠিত রাজনৈতিক দলের সংখ্যা কমছে। প্রচুর দল একটি পরিবারের চারপাশে ঘিরে থাকা দলে পরিনত হয়েছে। কিছু দলের কাছে শুধু জাত মুখ্য, তাঁদের সমর্থন জাতভিত্তিক। এই অসংগঠিত দলের মধ্যে কোনো গণতন্ত্র নেই। দলের নেতা হন পরিবারের বংশধরেরাই। আমরা দেখছি, বিশ্বের সর্ববৃহ   গণতন্ত্র-এ যোগ্যতার ভিত্তিতে নেতা হওয়ার থেকে পরিবারভিত্তিক নেতা হচ্ছেন, অর্থা   , এখানে পরিবারভিত্তিক গণতন্ত্র চলছে। এটা হলে রাজনীতির মান পড়তে বাধ্য। এখন চালকের আসনে এই পরিবারতান্ত্রিক ব্যবস্থা। শক্তিশালী নীতির জায়গায় জাতিগত জনপ্রিয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এই প্রবণতা সত্তেও আশার আলো আছে। ভারতে মধ্যবিত্ত শ্রেণী বাড়ছে। যাঁদের উচ্চাশা আছে, তাঁরা প্রসারিত হচ্ছেন। লোকে অধৈর্য হয়ে পড়ছে। জনমতই একমাত্র রাজনীতির দিশা পরিবর্তন করতে পারে। ভারতে সত্যিকারের গণতন্ত্র তখন বিকশিত হবে, যখন পদবি ও জাতপাতের পরিবর্তে দক্ষতা ও সংহতি আমল পাবে। এটাই

সুশাসনকে প্রভাবিত করবে।

নীতি অসারতা ও দারিদ্র দূরীকরণ

সুশাসনের জন্য কড়া নেতৃত্ব চাই। নীতি বানানোর ক্ষেত্রে দৃঢ় সিদ্ধান্ত চাই। নেতৃত্বের বিশ্বাসযোগ্যতা চাই। ভারতের আর্থিক নীতি ক্রমশ বৃহত্তর মতৈক্য চাইছে। আগামী দশকে আমাদের ৯ শতাংশ বা তার বেশি আর্থিক বৃদ্ধি চাই। ৯ শতাংশ বৃদ্ধির হার যদি বজায় থাকে তা হলে বিনিয়োগ আসবে, চাকরির সুযোগ তৈরী হবে। সরকার আরো বেশি রাজস্ব পাবে। বাড়তি রাজস্ব পরিকাঠামো ও সামাজিক ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যাবে। দারিদ্র দূরীকরণের প্রকল্পগুলি আরো গতি পাবে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে গত কয়েক বছর ধরে রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে নীতি অসারতা দেখা দিয়েছে ও তাঁদের বিশ্বাসযোগ্যতা কমছে। যেটা দরকার, দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্প ও আয়-এর প্রকল্পগুলি দিয়ে সামাজিক সম্পদ তৈরী করতে হবে। যেটা দরকার সেটা হলো দুর্বলতমদের, বিশেষ করে আদিবাসীদের ওপরে নিয়ে আসা, তাঁদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, গ্রামীন পরিকাঠামো ঠিক করাটা আজকের দিনে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ।

আমরা কি করে ৯ শতাংশ বৃদ্ধি নিশ্চিত করব।

৯ শতাংশ বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে গেলে ভারতকে সুনির্দিষ্ট নীতি নিতে হবে। আমাদের পরিকাঠামোর ব্যাপক উন্নতি করতে হবে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে টেলিকম ও জাতীয় সড়কের সাফল্যের সুফল দুর্নীতির জন্য নষ্ট হয়ে গেছে। পরিবেশ রক্ষার নাম একটা নতুন লাইসেন্সরাজ তৈরী করে,বড় আকারের শিল্প বন্ধ করে দেওয়াটাও দুর্ভাগ্যজনক। অর্থনীতি ও পরিবেশরক্ষাকে হাতে হাত মিলিয়ে চলতে হবে। খুব জরুরি হল উৎপাদনক্ষেত্রে সংস্কার চালু করা। আমরা এমন একটা সময়ে বাস করছি যখন ক্রেতারা সেটাই কেনেন যেটা সস্তা। তাই সাফল্যের শর্ত হল কম খরচে উৎপাদন। সুদের হারকে যুক্তিসঙ্গত করা, পরিকাঠামো ঠিক করা, বিদ্যুত ক্ষেত্রের সংস্কার চালু করা, আন্তর্জাতিক দরে কাঁচামাল হল আজ সবথেকে জরুরি বিষয়।

জাতীয় সড়ক, বিমানবন্দর, বন্দর, গ্রামীন রাস্তার ওপর জোর দিতে হবে। পর্যটনের সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার করতে ভারত ব্যর্থ হয়েছে। এর জন্য দরকার কম দামী হোটেল, ভালো বিমানবন্দর ও রেল স্টেশন। পর্যটন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর কর কমানো দরকার। দেশের মধ্যে পণ্য পরিবহন ব্যবস্থার সংস্কার দরকার। উঁচু হারে কর হল স্বল্পকালীন ব্যবস্থা, এর দীর্ঘমেয়াদী কোনও উপকার নেই। করের হার মাঝারি ও আন্তর্জাতিক মানের সমান হওয়া দরকার। বিদেশে জিনিস রফতানি করতে পার। তার থেকে রফতানি কর উঠে

আসবে। আমরা বেশ কিছু সাফল্যের গল্প শুনেছি। সাম্প্রতিক সময়ে আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, তথ্য প্রযুক্তি, টেলকম, ওষুধ, গাড়ি তৈরির শিল্প সড়ক, শহরের আবাসন ক্ষেত্রে বেশ কিছু সাফল্যের কাহিনী শুনেছি। একটা নতুন আইন, নতুন নীতি করে তাকে আরো আগে বাড়ানো দরকার, তাকে যেন কোনভাবে বাধা না দেওয়া হয়।

জোট সরকার

বড় মাপের নেতা ও বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিন শেষ। আজ কোনও দলই নিজের ক্ষমতায় বিশাল সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে আসতে পারবে না। ভারতের রাজনৈতিক কর্মসূচি পরিবর্তিত হয়েছে। স্বাধীনতার পর প্রথম কয়েক বছর কর্মসূচি আবর্তিত হত দেশের ঐক্য ও সংহতিকে ঘিরে। সার্বভৌমত্য ছিল প্রধান আগ্রহের বিষয়। এই সার্বভৌমত্বের বিষয়টি ঠিক হয়ে যাওয়ার পরে প্রধান বিষয় হল অর্থনীতি, দারিদ্র দূরীকরণ ও আঞ্চলিক আকাঙ্খা। আজ আরেকটি আগ্রহের বিষয় হল যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো। আজ যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ হল রাজ্যে আঞ্চলিক দলের সঙ্গে ক্ষমতা ভাব করে নেওয়া। জোটের নোঙ্গর হবে একটা জাতীয় দল। লোকসভায় তাঁদের যথেষ্ট সংসদ থাকবে। আঞ্চলিক দলগুলি ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করবে, তারা ঠিক করবে নয়াদিল্লিতে কে শাসন করবে। জোট যাতে মসৃনভাবে কাজ করে সে জন্য দরকার প্রধান দলের হৃদয় বড় হবে। এবং তারা আঞ্চলিক দলগুলিকে জায়গা দেবে। আঞ্চলিক দলগুলিও একটা জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলবে। এর ফলেই সুশাসন সম্ভব হতে পারে।

দুর্নীতি

দুর্নীতি আমাদের শাসনের সুফল খেয়ে নিচ্ছে। দুর্নীতি হলে বিনিয়োগকারীরা উতসাহ হারিয়ে ফেলে। এর ফলে দাম বেড়ে যায়। দুর্নীতির জন্য টেলিকম ও জাতীয় সদকের ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্যের কাহিনী রীতিমত বিঘ্নিত হয়েছে। কয়লার ব্লক বন্টনে দুর্নীতির ফলে বিদ্যুত ক্ষেত্র গভীর সংকটে পড়েছে। প্রথমে ভাবা হয়েছিল লাইসেন্স-রাজ শেষ করে দেওয়ায় দুর্নীতি কমবে। কিন্তু তা হয় নি। জমি সংক্রান্ত বিষয়, রিয়েল এস্টেট, প্রাকৃতিক সম্পদের বন্টন, খনি, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-এ চরম দুর্নীতি হয়েছে।

এটা খুবই খেদের বিষয় যে, স্বাধীনতার ৬৫ বছর পরেও রাজনৈতিক দলগুলিকে টাকা দেবার বিষয়টি এখনও অস্পষ্ট ও কার্যত অদৃশ্য। লোকপাল নিয়ে সাম্প্রতিক বিতর্ক একটা বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দিয়েছে, তা হল, দুর্নীতি বিরোধী আইনগুলি কঠোরভাবে রুপায়ন করা দরকার। দুর্নীতি বিরোধী একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য

যতই জনমতের চাপ থাকুক না কেন, সরকার স্বাধীন ও কার্যকর লোকপাল গঠন করতেই পারে। এক্ষেত্রে একটা বড় বিষয় হল, সরকারী কর্মীদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আসবে তা নিয়ে তদন্তকারী সংস্থার স্বাধীনতা থাকতে হবে। তদন্তকারী হিসাবে স্বাভাবিক পচ্ছন্দ হল সি বি আই। সি বি আই কি ভাবে কাজ করবে সেটা কি কেন্দ্রীয় সরকার ঠিক করে দেবে? সিলেক্ট কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা যে চূড়ান্ত খসড়া তৈরী করেছে তাতে আমি কিছু গুরুত্বপূর্ন পরিবর্তন সুপারিশ করেছি। সি বি আই ডিরেক্টর অবসরের পর কোনো সরকারী দায়িত্ব নিতে পারবেন না। তা হলেই সি বি এই ভয় ও পক্ষপাত ছাড়া কাজ করবে। লোকপালের অনুমতি ছাড়া তদন্তের মাঝপথে কোনও সি বি আই অফিসারকে বদলি করা যাবে না। তদন্ত শুরু করার আগে লোকপাল কোনও অভিযুক্ত সরকারী কর্মীর কথা শুনবে না। কারণ সরকারী কর্মী আগে জানতে পারলে যাবতীয় তথ্য প্রমান নষ্ট করে ফেলবে। লোকপালের নিয়োগের ক্ষেত্রে ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ চলবে না, কারণ এটা আমাদের সংবিধানের বিরোধী।

ন্যায্য ও স্বাধীন সমাজের নির্মাণ

জাতি ও ধর্মের ভিত্তিতে সামাজিক উত্তেজনাকে নির্মূল করতে হবে। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে নিরন্তর আলোচনার দরকার আছে। আন্তঃ সম্প্রদায় সম্পর্ক নিয়ে মন্তব্য খুব সাবধানে ও সংযতভাবে করা উচিত। পূর্ণতাপ্রাপ্ত সমাজের পরিচয় হল, তা দরদী ও নির্ভয় হবে। দিল্লির গণ-ধর্ষণের ঘটনা স্বাধীন সমাজের বিবেককে নাড়িয়ে দিয়েছে। মহিলাদের এখনো বঞ্চনার একটা যন্ত্র হিসাবেই দেখা হয়। ওই তরুনীর সঙ্গে যে ব্যবহার করা হয়েছে তা হল জান্তব। ভারত সভ্যতার পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে।

তফশিলি জাতি ও উপজাতিরা এখনো সুযোগ-সুবিধাহীন পরিবেশে বাস করে। অসাম্য দূর করে সময় আনতে আমাদের সদর্থক ব্যবস্থা নিতেই হবে। সংরক্ষণ হল দারিদ্র থেকে বেরিয়ে আসার ব্যবস্থা। এটা হল ঐতিহাসিক অবিচার দূর করার ব্যবস্থা।

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সহ্য না করাটা হল সাম্প্রতিক একটা প্রবণতা। একটা ভাষণ বা সিনেমার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে সারা সমাজকে ত্রস্ত করা হচ্ছে। অন্যদিকে যাঁরা জনজীবনে আছেন, তাঁদের সঠিক বাক্য চয়ন করতে হবে। তাঁদের কথা যেন উস্কানিমূলক না হয়। সম্প্রতি বৃহত্তর দূর্নীতির জন্য যে ভাবে কিছু জাতকে দায়ী করা হয়েছে তা আমি মানি না। মনে রাখতে হবে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সঙ্গে সংবিধান দায়িত্বের কথাও বলেছে।

সন্ত্রাসবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদ

সীমান্তপারের ও ঘরোয়া সন্ত্রাসের ফলে ভারত খুব খারাপভাবে প্রভাবিত হয়েছে।

দেশভাগের পর থেকে কাশ্মীর হল পাকিস্তানের কাছে অসমাপ্ত কর্মসূচি। পাকিস্তান কখনই কাশ্মীরকে ভারতের অঙ্গ হিসাবে মেনে নেয়নি। প্রথমে চিরাচরিত যুদ্ধ, তারপর গত দু দশক ধরে তারা সীমান্ত পরের সন্ত্রাস চালাচ্ছে। গত কয়েক বছর ধরে তারা ভারতে মডিউল তৈরী করেছে। তার মাধ্যমে তারা সন্ত্রাস ও হিংসা ছড়াচ্ছে।

পাকিস্তানকে বুঝতে হবে সীমানা আবার পুনরায় তৈরী করার যুগ চলে গেছে। জন্ডিস হওয়া চোখ নিয়ে ভারতের দিকে না তাকিয়ে পাকিস্তান যেন নিজের দেশের হাজার সমস্যা মেটানোর দিকে নজর দেয়। পাকিস্তানের স্টেট এক্টররা সংসদ আক্রমন, মুম্বইয়ে ২৬/১১-র হানা, ভারতীয় সেনার মুন্ডচ্ছেদ করার মত ঘৃন্য কাজ করেছে। পাকিস্তানে এখন সরকার, আই এস আই, সেনা, জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি সকলেই নিজের নিজের এজেন্ডা নিয়ে চলেছে। পাকিস্তানের সঙ্গে ভারত বা আমেরিকার সম্পর্ক স্বাভাবিক করা তখনি সফল হবে, যখন তারা সন্ত্রাসে মদত দেওয়া পুরোপুরি বন্ধ করবে। পাকিস্তান যদি বেশি সতর্ক ও কম মৌলবাদী হয়, তা হলে সেখানে অসামরিক সরকারের প্রভাব বাড়বে এবং রাষ্ট্রের মধ্যে সন্ত্রাসের মদতদাতাদের প্রভাব কমবে। একমাত্র তখনই আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারব।

পাকিস্তানকে বুঝতে হবে কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কাশ্মীরের সাংবিধানিক চরিত্র নির্ধারণ ও বাকি ভারতের সঙ্গে তার সম্পর্ক ঠিক করার সময় আমরা ঐতিহাসিক ভুল করেছি। এখন যেটা দরকার সন্ত্রাসবাদ ও বিচ্ছিনতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কাশ্মীরের লোকেদের সঙ্গে নিয়ে চলতে হবে। কাশ্মীরি যুবদের মধ্যে উচ্চাকাঙ্খী শ্রেণী তৈরী হচ্ছে। আমাদের নীতি হওয়া দরকার বিচ্ছিন্নতাবাদ-বিরোধী ও জনগণের পক্ষে।

ভারতের সামনে আরেকটি চ্যালেঞ্জ হলো মাওবাদী হিংসা। সারা দেশের ২০০ টি জেলা, যার মধ্যে দেশের মধ্যভাগের জেলাও আছে, মাও-প্রভাবিত। আদিবাসী এলাকায় মাওবাদীদের প্রতি সমর্থন অনেক প্রবল। ভারতের আর্থিক অধিকার প্রথমেই আদিবাসীদের থাকা উচিত। তাদের এলাকা হল সবথেকে পিছিয়ে পড়া ও অনুন্নত এলাকা। কিন্তু কিছু মাও প্রভাবিত এলাকায় যেতে হলে আপনাদের ল্যান্ড মাইন্ ও অস্ত্রের মোকাবিলা করে যেতে হবে। মাওবাদীরা সামাজিক সংস্কারক নয়। মাওবাদ কোনও দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্প নয়। মাওবাদ হল ভারতের গনতান্ত্রিক সংসদীয় ব্যবস্থাকে উৎখাত করার চেষ্টা। মাওবাদীরা যে অস্ত্র ব্যবহার করে

তার সিংহভাগ হল ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর□ মাওবাদী এলাকা থেকে মাওবাদীদের শেষ করতে আমাদের উন্নয়ন ও নিরাপূতামূলক ব্যবস্থা এই দ্বিমুখী পন্থা নিতে হবে□

জনসংখ্যা হল সম্পদ

ভারত হল যুবদের দেশ□ শুধু ভৌগলিক বিভাজনের ওপর ভরসা করা ঠিক হবে না□ উন্নত দেশে লোকবল কম□ ক্রমশ কমে যাওয়া জনসংখ্যা দিয়ে তারা তাঁদের অর্থনীতিকে সামলাতে পারবে না□ আমাদের দেশে মধ্যবিত্ত ও উচ্চাকাঙ্খী শ্রেণী সংখ্যায় বাড়ছে, শিক্ষা ও মানব সম্পদ বাড়ছে□ ফলে আমরা প্রশিক্ষিত মানব মন তৈরী করতে পারছি□ উন্নত দেশের এটা দরকার□ আমরা আমাদের এই বর্ধিত জনসংখ্যাকে আর্থিক দিক দিয়ে ব্যবহার করতে পারি□ ভারত ও উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে ভৌগলিক ব্যবধানের ফলে এটা সম্ভব হয়েছে□

ভারত হল সফট পাওয়ার

ভারতের ইতিহাস, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের সভত্যা, আমাদের জনসংখ্যা, আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং তার সঙ্গে ভারতের বিশেষ জাতীয় পরিচয়ের যাবতীয় প্রতীক, যেমন আমাদের খেলা, সিনেমা, সাহিত্য সবই ভারতকে সফট স্টেট করার সম্ভাবনা দিয়েছে□

সময়াভাবে আমি অল্প কিছি চ্যালেঞ্জ নিয়ে বললাম□ আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই, আমরা যদি এই গেম প্লান নিয়ে কাজ করি, আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগায়, তা হলে সেই সময় দুরে নয়, যেখানে আশা হতাশাকে পরাজিত করবে□